মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নতকরণের পূর্বাপরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি

বাংলাদেশ সম্ভবত পুরো বিশ্বেই অতুলনীয় এই অর্থে যে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে (২৯৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ প্লাস ৩২ = ১৯৯ টি আসন পেয়েছিল, পিপিপি পেয়েছিল ৮৬ টি) তখন পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (পিপিপি) সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করে জনগণের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ ও তাদের সিদ্ধান্তকে অবদমিত করে রাখার জন্য। পরবর্তীকালে, যখন বাঙালি জাতি ন্যায়বিচার এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করে, তখন পাকিস্তানি নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করে নির্বিচার গণহত্যা। যদি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের অধিকারের কোন মূল্য থেকে থাকে, তাহলে বাঙালি জাতিকে ৩০ লাখ শহীদ, ০২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি আর ০১ কোটি অসহায় মানুষের শরণার্থীর জীবন বরণের মাধ্যমে সে মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। অধিকন্তু, মোট সাড়ে সাত কোটি জনগণের ৩ কোটি মানুষকেই হতে হয়েছিল ঘরছাড়া। এ পরিমাণ চড়া মূল্য পরিশোধ করেই তবে গণতন্ত্র, ন্যায়নীতি, মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তাই আমি যখন দেখি, এই দেশের প্রত্যেকটি মানুষ মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী তখন আমি অবাক হই না। যখন অনেকে আমাদেরকে মানবাধিকার শেখানোর জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তখন বরঞ্চ আমার করুণা বোধ হয়, কারণ তাদের মধ্যে অনেকেরই রয়েছে ক্রীতদাস ব্যবসা, বর্ণবাদ, শোষণ, অত্যাচার আর নিপীড়নের সুদীর্ঘ কালো ইতিহাস।

বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার আগে, ইতিহাসের পাতায় একটু ঘুরে আসা যাক। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রার শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্বাধীনতার ১০ মাসের মধ্যে তারা ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার-এর মত মৌলিক নীতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশের সংবিধান প্রনয়ন করে। পাশাপাশি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের সাথে জড়িত অপরাধী ও সহযোগীদেরও বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এসময় প্রায় ২৬,০০০ হাজার সন্দেহভাজন অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে দ্রুত বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয়। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটতরাজ এবং এই জাতীয় অন্যান্য ঘৃণ্য অপরাধের সাথে জড়িত প্রায় ৮০০ অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে কারাগারে পাঠানো হয়। আওয়ামী লীগ যখন দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, বাঙালি জাতির ভাগ্যে নেমে আসে ৭৫ এর ১৫ আগস্টের কালো রাত। সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অরাজকতা আর সন্ত্রাস গ্রাস করে নেয় সমগ্র জাতিকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর মানবাধিকার সমুন্নত রাখার দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে সদ্য স্বাধীন বাঙালি জাতিকে এরপর একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থানের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা আর মানবাধিকার সমুন্নতকরণের যে স্বপ্ন নিয়ে এই দেশ স্বাধীন হয়, বাঙালি জাতির সেই স্বপ্ন ক্রমশ বিলীয়মান হতে থাকে। এই অস্থির আর অনিশ্চিত সময়কালে আমাদেরকে সামরিক, ছদ্ম-সামরিক এবং টেকনোক্র্যাট সরকারের শাসনকালের দুঃসহ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছিল। এসময় স্বাধীন বাংলাদেশে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের সকল অর্জন আর প্রচেষ্টাকে ভূলুণ্ঠন করা হয়। সামরিক সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বাতিল করে সকল বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়। সংবিধানকে ইচ্ছেমত সংশোধন করে এর মূলনীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এমনকি, জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যার সাথে জড়িতদের দায়মুক্তি দিয়ে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' নামে একটি আইন প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে বহু বছর ধরে বাঙালি জাতিকে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তৎকালীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সরকার গঠন করেন। নবগঠিত সরকার 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। আওয়ামী লীগ সব সময় স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিশ্বাসী। তাই ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে গেলে তারা বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন জোটের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। কিন্তু বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে সূচনা হয় সন্ত্রাস, মৌলবাদ, হত্যা, নৃশংসতা ও নিপীড়নের নতুন এক অধ্যায়। ব্রিটিশ সাংবাদিক বার্টিল লিন্টার Far Eastern Economic Review-এর ২০০২ সালের ৪ এপ্রিল-এ প্রকাশিত সংখ্যায় "Bangladesh: A Cocoon of Terrorism" শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। একইভাবে, আরেকজন সাংবাদিক অ্যালেক্স ফেরি ২১ শে অক্টোবর, ২০০২ সালে টাইমস এশিয়া ম্যাগাজিনে "Reigning the Radicals of Time" নামক নিবন্ধ লিখেন। এর পরে ২০০৫ সালের ২৩ শে জানুয়ারী নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয় এলিজা গ্রিসোল্ড এর "The Next Islamic Revolution"। অধিকন্তু, সুধারামাচাঁদরাম ("Mixing Terror with Aid", এশিয়া টাইমস,

অক্টোবর ২, ২০০৫) এবং সেলিগ হ্যারিসন ("Bangladesh in a new hub of Terrorism", ওয়াশিংটন পোস্ট, ২ আগস্ট, ২০০৬) দেশে চরমপন্থার উত্থানের বর্ণনা দেন। এসব নিবন্ধে একটি বিষয়ই বারবার ফুটে উঠেছিল- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িকতা, ইসলামিক মধ্যপন্থা, মানবাধিকার আর ধর্মীয় সম্প্রীতির যে নীতিসমূহকে ধারণ ও লালন করতেন, তা হতে দূরে সরে গিয়ে ক্রমশই মৌলবাদের দিকে বাংলাদেশের ঝুঁকে পড়া। আমার স্মরণে আছে "M.B. Mecca" শিরোনামে একটি নিবন্ধের কথা। এই নিবন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়, কিভাবে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে পড়ছিল। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিল আফগানিস্তান ফেরত ১০০ জন আল-কায়েদা জঙ্গী চট্টগ্রামে অবতরণ করে। বিএনপি-জামাত সরকারের নীরব সমর্থনে সারা দেশে ১৭০টিরও বেশি জিহাদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ওয়াশিংটনভিত্তিক একজন সাংবাদিক আর্নল্ড ডি বোরচগ্রেভ ২০০৩ সালের মে মাসে "Cry for Bangladesh" নামে একটি নিবন্ধ রচনা করেন, যেখানে তিনি বাংলাদেশে গড়ে ওঠা একটি "ওসামা ফ্যান ক্লাব" এর কথা উল্লেখ করেন যার সদস্যরা স্লোগান দিত " বাংলা হবে আফগান, আমরা হব তালিবান"। আমরা সেই দুঃসহ শাসনামলে অনেক জঙ্গি সন্ত্রাসীর উত্থান দেখেছি। এমনই একজন জঙ্গি সন্ত্রাসী ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান, যিনি 'বাংলা ভাই' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বৃহত্তর রাজশাহীর অনেক জায়গায় প্রকাশ্যে পিটিয়ে মানুষকে হত্যা করে গাছ থেকে লাশ ঝুলিয়ে দিতেন। পুরো দেশব্যাপী জঙ্গিবাদ ছত্রাকের মত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। আদালতকক্ষে সেশন চলাকালে বোমা হামলা করে দুই বিচারপতিকে হত্যা করা হয়। জঙ্গিরা এমনকি তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালায়। তিনি নিজে ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর একজন সহযোগী এই হামলায় নিহত হয়। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদদের নিয়মিতই আক্রমণের শিকার হতে হত। এক দিনে বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে ৪৯৫টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। এমনকি ও ২০০৪ সালের ২১ শে আগস্ট উগ্রবাদ ও ব্যাপক দুর্নীতির উত্থানের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আয়োজিত সমাবেশে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য চলাকালে তাঁকে লক্ষ্য করে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মৃত্যুর মুখ থেকে ভাগ্যক্রমে ফিরে আসলেও এই গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হন এবং দলের আরও ৩৭৪ জন সদস্য গুরুতরভাবে আহত হন, যাদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হোন।

আমি ৯/১১ এর পাঁচ বছর আগে, ৯/১১ এর পাঁচ বছর পরে- এই ১০ বছরের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ঘটনা ও এতদফলে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করি। সারণি-১ হতে দেখা যায়, ১৯৯৬-২০০১ সাল (আওয়ামী লীগ আমলে)-এ সময়ে কেবলমাত্র ৭টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেও, ২০০১-২০০৬ সালের বিএনপি-জামাত আমলে এই সন্ত্রাসী ঘটনার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৫৩ এ। একইভাবে ১৯৯৬-২০০১-এ সন্ত্রাসী ঘটনার ফলে মৃত্যু সংখ্যা ৫৮ থাকলেও তা ২০০১-২০০৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭০ এ। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের এই পরিমাণ প্রবৃদ্ধি, শুধু অত্র অঞ্চলে নয়, সমগ্র বিশ্বেই ছিল বিরল।

তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ২০০১-২০০৬ সালের বিএনপি-জামাত শাসনকালীন সময়কে 'সন্ত্রাস, অরাজকতা ও জঙ্গীবাদের স্বর্ণযুগ' বলা হতো। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, জঙ্গী সন্ত্রাসীদের নিন্দা করার পরিবর্তে ঢাকাস্থ মার্কিন কর্মকর্তারা সেই সময় জঙ্গিবাদ এবং জামায়াতে ইসলাম দলটির মধ্যে যে কোনও সম্পর্কের অভিযোগকে দ্রুত খারিজ করে দেয়। যাই হোক, এই ধরনের জঙ্গিবাদের ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তির ফলে অবশেষে মার্কিন কর্মকর্তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং জামায়াতে ইসলামী পার্টির অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

সারণি-০১

সন্ত্রাসী ঘটনা ও প্রাণহানি বৃদ্ধি
৯/১১ এর আগে এবং পরে

অঞ্চল	সন্ত্রাসী ঘটনা		মৃত্যু	
	১-২৭-১৯৯৬ হতে ৯- ১১-২০০১	৯-১২-২০০১ হতে ৭-২৭-২০০৬	১-২৭-১৯৯৬ হতে ৯- ১১-২০০১	৯-১২-২০০১ হতে ৭-২৭-২০০৬
দক্ষিণ এশিয়া	৪৬০	৪১৩৮	১৪১৬	৪৯১৯
উত্তর আমেরিকা	৬১	৬৪	২৯৮৮	৮

(তথ্যসূত্র: *MIPT Terrorism Knowledge Base, ওকলাহোমা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র*)

মানবাধিকার

আমাদের জাতির পিতা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যেখানে খাদ্যের অধিকার, বস্ত্রের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আর ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। আপামর জনসাধারণের জন্য এই অধিকারসমূহকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এসব লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। এখন বাংলাদেশে কেউ অনাহারে মারা যায় না। একসময় যে মঙ্গায় উত্তরবঙ্গের কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার কষ্টে পীড়িত হোত, সে মঙ্গা শব্দটিকেই আমরা যাদুঘরে পাঠাতে সক্ষম হয়েছি। শেখ হাসিনার সরকার সকলের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভোটার জালিয়াতি বন্ধ করতে তিনি ভোটারদের জন্য বায়োমেট্রিক নিবন্ধনসহ পিকচার আইডেন্টিফিকেশন কার্ড এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ভোট প্রদান ব্যবস্থা চালু করেছেন। হয়তো, আমাদের অল্প কিছু ভোট কেন্দ্রে সীমিত পরিসরে সহিংসতা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে, এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মনে করলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে নতুন করে আবার ভোট গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের কোথাও শতভাগ নির্ভুল ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা নেই। তবে আমরা নির্ভুল ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই; আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। প্রকৃতপক্ষে, গণতন্ত্র প্রক্রিয়াটাই "ট্রায়াল এন্ড এরর" এর মাধ্যমে অগ্রসর হয়। বিএনপির আমলে তারা ১কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার সৃষ্টি করেছিল। আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে তারা ১৯৯৬ সালে ভোটারবিহীন নির্বাচন পরিচালনা করেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে সেই কালো দিনগুলো এখন অতীত। যাইহোক, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, যেখানে তারা ২৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে আইনের শাসন আর গণতন্ত্রের চর্চা করে আসছে, সেখানে ৭৭% রিপাবলিকান ভোটার মনে করেন যে সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন "ভোটার জালিয়াতি" এর মাধ্যমে "চুরি" হয়েছিল (***তথ্যসূত্র: মনমাউথ ইউনিভার্সিটি পোল***) এবং ৬৪% আমেরিকান বিশ্বাস করে যে মার্কিন গণতন্ত্র ব্যবস্থা "সংকট এবং ব্যর্থতার ঝুঁকিতে রয়েছে" (**তথ্যসূত্র: *এনপিআর / আইপিএসওএস পোল***)। তারা এটাও মনে করে যে আমেরিকান গণতন্ত্র মূলত অর্থের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, দেশটির আইনপ্রণেতাদের ৯১%কে বিভিন্ন ওয়াল স্ট্রিট কোম্পানি কোন না কোনভাবে অর্থায়ন করেছিল। এই অবস্থার তুলনায়, আমরা অনেক ভালো করছি। তবে, আমরা আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে চাই না। বরং, আমরা আরো ভালো কিছু করতে চাই। আমরা আমাদের শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে চাই, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিরল।

মানবাধিকারের নীতিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অন্য অনেক দেশের মত কেবলমাত্র মুখের বুলি আওড়ানোতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের নীতি ও গৃহীত পদক্ষেপে তা প্রতিফলিত হয়। নির্বিচার গণহত্যা, নৃশংসতা ও নিপীড়নের মুখে যখন ১১ লাখ রোহিঙ্গা নিজভূম মিয়ানমার হতে প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হয়, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে এসে রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় প্রদান করে পুরো বিশ্বকে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করেন। যাইহোক, আমি বন্ধুপ্রতীম সকল দেশের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা এই মানবিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সমর্থন করে আসছে। অসহায়, নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের জন্য অবিরাম সহায়তা প্রদান করার জন্য আমি বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করতে চাই। এই অসহায় রোহিঙ্গাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে স্ব স্ব দেশে স্থানান্তর করার জন্য আমি বিশ্বের সকল দেশকে উদাত্ত আহবান জানাই। আমি শুনেছি কিছু মার্কিন আইনপ্রণেতা রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য অধিকতর ভাল শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। আমি আপনাদের অনুভূতিকে পুরোপুরি সমর্থন করি এবং আমি প্রস্তাব করছি এই অসহায় শিশুদেরকে আপনাদের দেশে নিয়ে তাদের জন্য আরও ভাল শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

জোরপূর্বক অন্তর্ধান

আমি উল্লেখ করতে চাই যে জাতিসংঘের জোরপূর্বক অন্তর্ধান বিষয়ক ওয়র্কিং গ্রুপ তথাকথিত "জোরপূর্বক অন্তর্ধান" এর ৭৬ টি কেইস আমাদের নিকট প্রেরণ করেছে। আমরা বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে আমলে নিয়েছি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে গঠনমূলকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। যাইহোক, খোঁজখবর করে আমরা দেখতে পাই যে, এই ৭৬ জনের মধ্যে দুইজন বিদেশী

নাগরিক রয়েছেন আর অন্যদিকে একটি কেইস ২৭ বছরের বেশি পুরানো যখন কিনা আওয়ামী লীগ সরকারই ক্ষমতায় ছিল না। আমরা ইতোমধ্যে খুঁজে বের করেছি, এই তালিকার ১০ জন ব্যক্তি পুনঃআবির্ভূত হয়েছেন। পুনঃআবির্ভাবের এই যে ১০ টি ঘটনা, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী সংস্থা কর্তৃক এতদবিষয়ে মনগড়া তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এটা বরং দুর্ভাগ্যজনক যে ওয়ার্কিং গ্রুপ সঠিকভাবে যাচাই না করেই আমাদের নিকট এ ধরনের তথ্য প্রেরণ করেছে। জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের উচিত অন্য কোন উৎস হতে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর না করে, নিজস্ব গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করা, যাতে জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। আমাদের বিদেশী বন্ধুদের উচিত আরো সচেতনতা অবলম্বন করা যাতে মানবাধিকার কর্মী, নাগরিক সমাজের সদস্য বা এনজিও কর্মীর ছদ্মাবরণে কেউ রাজনৈতিক লক্ষ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বানোয়াট তথ্য প্রদান করতে না পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং সুপ্রশিক্ষিত পুলিশ বাহিনী সত্ত্বেও, প্রতি বছর প্রায় হাজার খানেক লোক যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া ছাড়াই ডিউটিরত পুলিশের গুলিতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় (**তথ্যসূত্রঃwww.statista.com**) এবং প্রতি বছর প্রায় ছয় লক্ষ লোককে নিখোঁজ হিসাবে রিপোর্ট করা হয় (**তথ্যসূত্র: www.statista.com**)।

সারণি-২

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে নিহত

বছর	সংখ্যা
২০২১	১০৫৫
২০২০	১০২০
২০১৯	৯৯৯
২০১৮	৯৮৩
২০১৭	৯৮১

(তথ্যসূত্র: *Statista Research Department, www.statista.com*)

সারণি-৩

যুক্তরাষ্ট্রে নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা

(National Crime Information Center (NCIC) ডাটাবেস অনুযায়ী)

বছর	সংখ্যা
২০২১	৫,২১,৭০৫
২০২০	৫,৪৩,০১৮
২০১৯	৬,০৯,২৭৫
২০১৮	৬,১২,৮৪৬
২০১৭	৬,৫১,২২৬

(তথ্যসূত্র: *www.statista.com; দ্রষ্টব্যঃ* একজন ব্যক্তিকে নিখোঁজ বলে মনে করা হয় যখন তিনি অদৃশ্য হয়ে যান এবং এবং তার অবস্থান অজানা থাকে। নিখোঁজ বলে বিবেচিত একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায়ও অন্তরালে চলে যেতে পারেন।)

সম্প্রতি যুক্তরাজ্য মানবাধিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বাংলাদেশে 'ধর্ষণ ও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স' এর সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ফলশ্রুতিতে আমি কিছু তথ্যানুসন্ধান করে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান খুঁজে পাইঃ

সারণি-৪

২০২০ সালে বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের ঘটনার সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

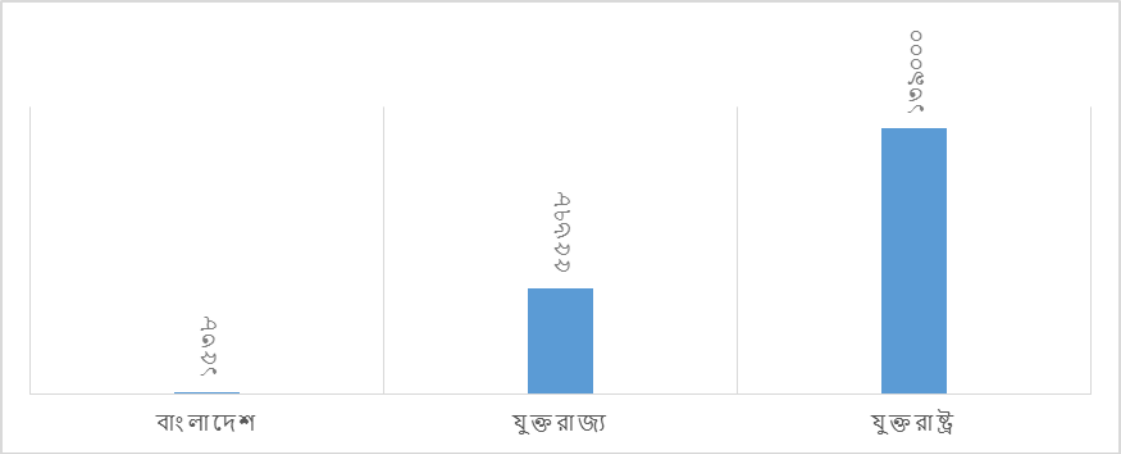

(তথ্যসূত্র: Statista.com; sharenet-Bangladesh.org)

২০২০ সালে কোভিড চলাকালীন সময়, বাংলাদেশে মোট ১৫৩৮ টি ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া যায়, যেখানে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ছিল যথাক্রমে ৫৫,৬৭৮ এবং ১,৩৯,০০০। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যা মাত্র ৬৭ মিলিয়ন, যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম (১৬৫ মিলিয়ন)। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বাংলাদেশের দ্বিগুণ। দেখা যায়, মোট জনসংখ্যা এবং ধর্ষণের সংখ্যা বিবেচনা নিলেও যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা অতি নগণ্য।

তথাপি বাংলাদেশ সরকার ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার ইতোমধ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে যাতে ধর্ষণের অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। যাইহোক নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলায় আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগতে চাই না। বরঞ্চ নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা দমন সবসময় আমাদের বিচার ব্যবস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য অগ্রাধিকার হিসেবে বজায় থাকবে।

দেশের গণতান্ত্রিক পরিসর ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কিছু বন্ধুর 'উদ্বেগ'-এর বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এবং স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার সরকার শুধুমাত্র জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কোনও বাহ্যিক হস্তক্ষেপ বা অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র আমাদেরকে এই লক্ষ্য হতে বিচ্যুত করতে পারবে না। বাংলাদেশে সবসময়ই অত্যন্ত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়ে আসছে। এই দেশে এমন নির্বাচন খুব কমই হয়েছে, যেখানে ৭২% এর নিচে ভোট পড়েছে। এই তুলনায়, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ভোট ৩৫% থেকে ৬০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং গড় ভোট থাকে প্রায় ৪৫% এর মত যা বাংলাদেশের ৭২% ভোটের চেয়ে অনেক কম।

পরিশেষে, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং পূর্বপরিচয় নির্বিশেষে প্রতিটি জীবনই সমানভাবে মূল্যবান। জাতিসংঘে বাংলাদেশ শান্তির সংস্কৃতিকে সমুন্নত করে চলেছে। শান্তির সংস্কৃতির মূল উপাদান হচ্ছে সহিষ্ণু মানসিকতা গড়ে তোলা-ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা পূর্বপরিচয় নির্বিশেষে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা লালন করা। আমরা যদি সকলের মাঝে এই মানসিকতা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে পৃথিবী হতে ঘৃণার বিষ হ্রাস পাবে এবং সহিংসতা কমে যাবে, যার ফলে সারা বিশ্বেই টেকসই শান্তি বিরাজ করবে। মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সমুন্নতকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবই কেবল পারে বিশ্বের সকল মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে।

#

লেখক বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পিআইডি ফিচার